নাট্যিক প্রসঙ্গ অনুসন্ধানে টাঙ্গাইল অঞ্চলের বৈঠকি গান

মো. রওশন আলম*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় টাঙ্গাইল জেলাতেও রয়েছে বিচিত্র ভঙ্গিমার নাট্যমূলক আখ্যানের সমৃদ্ধ সম্ভার। যার একটি উল্লেখযোগ্য, নান্দনিক ও বিস্তৃত আঙ্গিক হচ্ছে বৈঠকি গান। বৈঠকি গান এক প্রকার নাট্যমূলক সংগীত ধারা। যাকে আমরা ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের মিশ্র নাট্য পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। কেননা অন্যান্য মিশ্র নাট্য আঙ্গিকের ন্যায় বৈঠকি গানেও চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা কাহিনির উপস্থাপন দেখা যায় না। তবে এতে নাট্য ক্রিয়া ও ঐহিত্যবাহী নাট্য আঙ্গিকের প্রায় সকল উপাদানই বিদ্যমান। এর উপস্থাপনগত বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা এবং বাচিকাভিনয়, আঙ্গিকাভিনয় ও সাত্তিকাভিনয়ের যূথবদ্ধতা একে গীতাভিনয়ের পাশাপাশি সমৃদ্ধ নাট্য আঙ্গিক রূপে আমাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের বেশিরভাগ আঙ্গিকেই গানের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তদ্রূপ বৈঠকি গানেও পালাগান, কিচ্ছাগান, জারিগান, কবিগান, একদিল পীরের গান, বেইলার গান, গাজী-কালুর পালা, রামায়ণ গান, কুশান গান, কীর্তন গান, অষ্টক গান, বিষহরির গান, রয়ানি গান, মানিক পীরের গান, যিশুর যাতনা ভোগের পালাগান, গম্ভীরা গান, আলকাপ গান প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের ন্যায় নাট্যিক উপস্থাপনার প্রচলন রয়েছে। বৈঠকি গানের বিষয় বৈচিত্র্যে নাট্যিক প্রসঙ্গ অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।]

ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য 'বৈঠকি গান' অনেকের মতে কেবল লোক সঙ্গীতের পর্যায়ভূত হলেও, এর নাট্যিক কথোপকথন বা সংলাপ, গায়ক বা অভিনেতার অঙ্গভঙ্গিমা এবং দোহার বা বাদ্যযন্ত্রীদের সহযোগিতা তথা উপস্থাপনা খুব সহজেই একে নাট্য আঙ্গিক রূপে পরিচয় করিয়ে দেয়। টাঙ্গাইল অঞ্চলের বৈঠকি গান এখানকার নিজস্ব লোক সংস্কৃতির একটা অন্যতম অংশ। টাঙ্গাইল জেলার প্রত্যেকটি (১২ টি) উপজেলাতেই বৈঠকি গানের প্রচলন রয়েছে। বৈঠকি গানের পরিবেশনায় ভিন্নতা থাকলেও মূলত সব ধরনের বৈঠকি গানে প্রায় একইরূপ ভক্তিমূলক, মুর্শিদি বা ভজন অথবা বিচ্ছেদ গান গাওয়া হয়। এই গানগুলোর মূল গায়েনরা সাধারণত মারফত পন্থী হয়ে থাকেন। সনাতন ধর্মাবলম্বী গায়েন সাধকরাও পরমাত্মায় বিশ্বাস নিয়ে ভজন বৈঠকি গানে বিভোর হয়।

মারফতপন্থি এই বাউল-ফকির ও বৈষ্ণবদের সাধন ভজন কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই রকমের। প্রাসঙ্গিকভাবেই টাঙ্গাইল জেলায় প্রতি গ্রামেই মারফতপন্থি পির ফকির বা ভক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রখ্যাত লোকবিজ্ঞানী ওয়াকিল আহমেদও তাঁর অনেক লেখায় টাঙ্গাইল অঞ্চলের মুর্শিদি গানের প্রচলনের কথা প্রকাশ করেছেন। ড. মোঃ আবদুল করিম মিঞা তাঁর টাঙ্গাইলের লোকসংগীত গ্রন্থে বলেছেন, 'ভূতে ধরা রোগীর ভূত হাজির করার জন্য কবিরাজরা এক ধরনের গান গেয়ে থাকে। যাকে বৈঠকি গান বলা হয়ে থাকে' (আবদুল করিম, ২০০৮ : ৩৪)। আবার টাঙ্গাইল অঞ্চলে দেখা যায়, গুরুবাদী ভক্ত বাউলরা সারা রাতব্যাপী বৈঠক করে

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

আসর জমিয়ে বিভিন্ন পালা গান করে। যেমন, গুরু-শিষ্য, শরিয়ত-মারফত, স্বামী-স্ত্রী, হাশর-কেয়ামত ইত্যাদি নামে অভিহিত এসব পালাকেও বৈঠকি গান বলা হয়ে থাকে।

অনেক সময় দেখা যায়, এ অঞ্চলের বয়োবৃদ্ধ ভাবুক শ্রেণির লোকেরা জোৎস্না রাতে কারো বৈঠকখানায় ভজন গানের আসর জমায়। নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসে গান গায়। ভক্ত মানব গুরুর পরিচর্চা করেই পরম গুরুর নৈকট্য পেতে চায়। ভক্তের বিশ্বাস পরম গুরুকেই যদি ইহজনমে না পাওয়া যায় তবে মানব জনমই বৃথা। তাই গুরুর চরণ ভজনার জন্য এত ব্যাকুল। ভক্তরা গুরুকে আসরে পরমগুরু, দয়ালগুরু, দয়ালচাঁন, মুরশিদ, মুরশিদচাঁন প্রভৃতি নামে ভজনা করে। অর্থাৎ স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর মহিমা কীর্তনমূলক গানের নামই ভজন গান। আর বৈঠক করে এই ভজন গান গাওয়া হয় বলে একে বলা হয় ভজন বৈঠকি গান। উল্লেখ্য যে সব বৈঠকি গানে প্রায় একই রূপ গান গাওয়া হয়। স্রষ্টা বা পরম গুরুকে আহ্বান, ভজন, বিচ্ছেদ প্রভৃতি গানই গাওয়া হয়। সুতরাং বৈঠকি গানের উদ্ভব এই বাউল শ্রেণি বা ভাবুক শ্রেণির মাধ্যমেই হয়েছে।

বাউলদের উদ্ভব প্রসঙ্গে নানা জনের নানা মতামত প্রচলিত রয়েছে। তবে বাউল বা গুরুবাদী ধারণা ভারতীয় সাহিত্যে অতি পুরাতন এ বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেও গুরুবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে আমরা গুরুকে ত্রাণকর্তা, সৎপরামর্শদাতা রূপে দেখতে পাই। বাউল মতের উদ্ভবকাল সম্পর্কে ড. মাযাহারুল ইসলাম বলেন–

> সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিকতার ভগ্নাবশেষ অবলম্বন করে একটি ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে বাউল মতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উদ্ভূত বাউল সম্প্রদায়কে একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। (মাযাহারুল, ১৯৬৭)

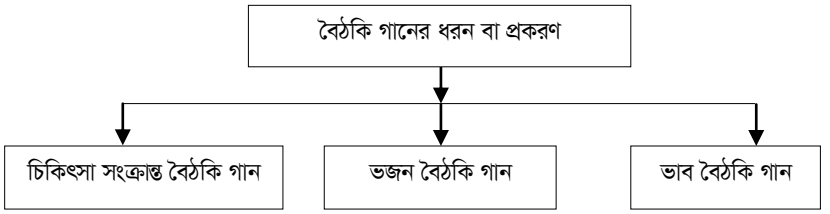
অর্থাৎ বাউল মতাদর্শ প্রাচীন হলেও এটি সময়ের বিবর্তনে নানা দিকে বাঁক নিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আউল-বাউলদের বসতি রয়েছে। গবেষক হাবিবুর রহমানের মতে মধুপুর উপজেলা বাদে সমগ্র টাঙ্গাইল জেলার প্রধান সংগীত বাউল গান। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে মধুপুর উপজেলায়ও বাউল গান ও বাউলদের বিস্তৃতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল করীমের সমীক্ষায় দেখা যায়– ময়মনসিংহ অঞ্চলে অর্থাৎ টাঙ্গাইল জেলায় 'মুর্শিদি' গানের প্রচলন আছে' (আবদুল করিম, ২০০৮ : ৭০)। রবীন্দ্রনাথের প্রণোদনায় ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগের সন্ত সাধকদের স্বরূপ সন্ধানে ব্যাপৃত হন। ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা বক্তৃতায় তিনি বিষয়রূপ বেছে নেন বাংলার বাউল। বক্তৃতায় তিনি টাঙ্গাইলের পাগল চাঁদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ বাউল মতের উদ্ভবের সময় থেকেই টাঙ্গাইল অঞ্চলে বৈঠকি গানের প্রভাব ছিল। পাগল চাঁদ ছাড়াও ফকির জ্ঞানদাস, নওশের পাগলা, ফালু চান ফকির, দুর্জন পাগলা প্রমুখের মাধ্যমে টাঙ্গাইল অঞ্চলে এই গুরুবাদী আধ্যাতিক বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্ভবপর হয়েছে।

এদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে ভাবুক শ্রেণির ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে অনেকেই যেহেতু কবিরাজি চিকিৎসা সম্পর্কেও বেশ পারদর্শী ছিল, সেহেতু এই বাউল শ্রেণির মানুষের

দ্বারাই বৈঠকি গানের উদ্ভব ঘটে। এ বিষয়ে একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, আমরা জানি গ্রামাঞ্চলের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষ জিন বা ভূত ধরার কথা বিশ্বাস করে। আর টাঙ্গাইল জেলার মানুষের মধ্যে এ ধারণা অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। যার প্রমাণ আজও টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান। এখানে জিন-ভূতে ধরা রোগীদের চিকিৎসা গ্রামের বাউল শ্রেণির ফকিররাই করে থাকে। আর অনেক সময় তারা এই কাজে বৈঠক করে গানের আয়োজন করে থাকে। যাকে বলা হয় বৈঠকি গান। এছাড়া এই ভাবুক বা বাউল শ্রেণির মানুষেরা প্রায় সময় রাতের বেলা গোল করে বৈঠকখানা তৈরি করে সেখানে ভজন গানের (বৈঠকি গান) আয়োজন করে। আর শীতকালে সারা রাতব্যাপী বাউল গানের বৈঠকতো টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি টাঙ্গাইল অঞ্চলের এই বৈঠকি গানের উদ্ভব এ অঞ্চলের ভাবুক শ্রেণি বা বাউল শ্রেণির দ্বারাই হয়েছে।

নাট্যিক প্রসঙ্গ সন্ধান

সংগীতরূপ বিবেচনায় টাঙ্গাইল অঞ্চলের বৈঠকি গানের সঙ্গে অন্যান্য প্রচলিত বৈঠকি গানের মিল থাকলেও পরিবেশনার কারণে টাঙ্গাইল অঞ্চলের বৈঠকি গানে বেশকিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। পরিবেশনার এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই নাট্যিক অনুষঙ্গের পরিচয় মেলে। কেননা নাটক হচ্ছে নাচ, গান, বাদ্য, অভিনয় প্রভৃতি শিল্পের এক যৌথ প্রয়াস। নাট্যাভিনয়ে গান কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ভরত মুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে দেখিয়েছেন– 'সুন্দর বাক্য, সুন্দর গান, সুন্দর পাঠ্য (কথা) এবং শাস্ত্রোক্ত কর্মের সমাবেশ (আদর্শ) প্রয়োগ (অভিনয়) বলে কথিত' (সুরেশচন্দ্র, ১৯৮২ : ২৩৯)। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের প্রায় সকল আঙ্গিকেই গীতের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। যে কারণে বৈঠকি গানও নাট্য আঙ্গিকের বিশেষ ধারা রূপেই পরিগণিত হয়। টাঙ্গাইল জেলায় সাধারণত ৩ ধরনের বৈঠকি গানের আসর দেখা যায়। যথা–



ক. চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈঠকি গান

বর্তমান সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের আধুনিকায়নের ফলে চিকিৎসা পদ্ধতি যেভাবে মানুষের হাতের নাগালে চলে এসেছে অতীতে ঠিক এরূপ ছিল না। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ ছিল অশিক্ষিত। যে কারণে ডাক্তারি চিকিৎসার ব্যাপারে তাদের অনাগ্রহ ছিল। অজ্ঞাত পির, ফকির, সাধু-সন্ন্যাসীর পানি পড়া, তাবিজ-কবজ বা ঝাড়-ফুঁকই ছিল সেকালের চিকিৎসায় প্রথম ভরসা। যারা ভূতে ধরা রোগীর চিকিৎসা করেন তাদের বলা হয় কবিরাজ বা পির-

ফকির। টাঙ্গাইল অঞ্চলের প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ জিন-ভূতে বিশ্বাসী। এখানে দেখা যায় কবিরাজরা ভজন গানের বৈঠক সাজিয়ে ভূতে ধরা রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন। রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে বৈঠকি গানের আয়োজন করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে কবিরাজ তার দুই-তিনজন শিষ্যদের নিয়ে রোগীর বাড়িতে উপস্থিত হন। অন্যদিকে ঢোল, জুড়ি, চটক, করতাল নিয়ে বসে পড়েন ভাবুক শ্রেণির মারফতপন্থি গায়ক ও দোহাররা। গানের বৈঠক শুরু হয় রাত নয়টা-দশটার দিকে। গানের মাধ্যমে দয়াল গুরুকে আসরে ডাকা হয়—

দয়াল চান দয়া করে
এস তোমার এই আসরে।
তোমার এই আসরে না আসিলে
দোহাই লাগে চরণে॥
(হামিদ আলী, ২০১৬)

তবে এর শুরু হয় বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য আঙ্গিকের ন্যায় বন্দনার মাধ্যমেই। আল্লাহ, নবী, পির-মুরশিদের নামে গাওয়া হয় বন্দনা—

প্রথম আল্লার নাম দেই সেলাম
দরূদ নবীজীর।
পৃথিবীর যত লোক ভাই
হযরতেরে দেয় সেলাম।
আলহামদু আলামতারা
নিল্লাহি নামাজ সারা
পাঁচ কালেমা পইরারে বান্দা হওরে এক্কিন।
(হামিদ আলী, ২০১৬)

আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালিয়ে নাট্যিক কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে আসন তৈরি করেই এই বন্দনা গাওয়া হয়। অর্থাৎ শুরু থেকেই এখানে নাট্যিক অনুষঙ্গ বিদ্যমান।

চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈঠকি গানের পরিবেশনায় মূল গায়েনের যে উপস্থাপনা তাতে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের ন্যায় অভিনয়ের বিষয়টিও দৃষ্টিগোচর হয়। টাঙ্গাইল জেলার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস গ্রামের গাবগাছ, তেতুল গাছ বা নির্জন নদীর কিনারায় ভূত থাকে। দুপুর বা সন্ধ্যায় ঐসব জায়গায় কেউ একা গেলে তার উপর ভূতের আসর (কুদৃষ্টি) হয়। আবার চৈত্র মাসের শেষ সাতদিন চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজা করে। পূজায় ঢাক-ঢোল বাজানো হয়। এই ঢাক-ঢোলের বাজনাকে বলা হয় 'ঢাকের বারি'। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস (লোক বিশ্বাস) ঢাকের বারিতে ভূত-পেতনি উতলা হয়ে মানুষের উপর আসর করে। তখন তারা নানা রকম উদ্ভট আচরণ প্রকাশ করতে থাকে। যাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'ভূতে ধরা'। আর ভূতে ধরা রোগীকে ভালো করার জন্যই আয়োজন করা হয় বৈঠকি গানের। গানের এক পর্যায়ে রোগী একাত্ব প্রকাশ করে এবং জিকির করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে রোগীর শরীর ক্লান্ত হতে থাকে এবং এক সময় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। রোগীকে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করা হয়। প্রয়োজনে মাথায় পানি ঢালা হয়। রোগীর জ্ঞান ফিরলে সে সুস্থ বোধ করে। এই যে বৈঠক করে গায়েনের হাত পা এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে গান ও রোগীর একাত্বতা প্রকাশ এবং বন্দনা শুরুর পূর্বে কৃত্যাচার পালন সব কিছুতেই নাট্যিক অনুষঙ্গ

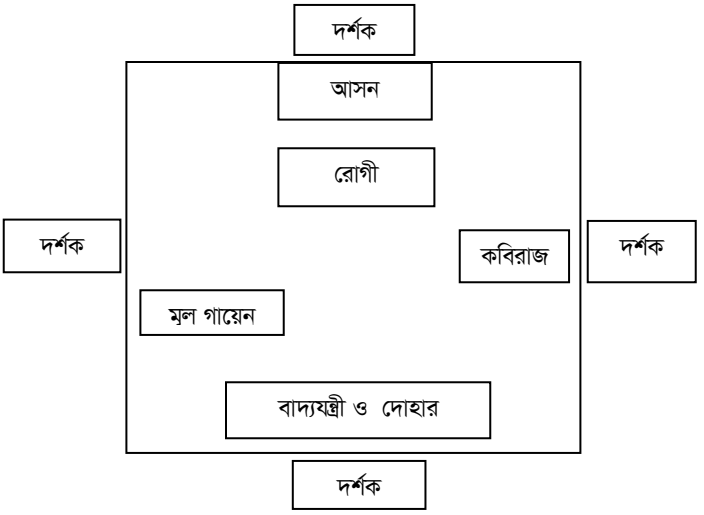
বিদ্যমান। যেকোনো কৃত্যানুষ্ঠানই যে থিয়েট্রিক পারফরম্যান্স তা নাট্যতাত্ত্বিক শেখনার তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁর মতানুযায়ী যেকোন কৃত্যানুষ্ঠানকে যদি কেউ থিয়েট্রিক পারফরম্যান্স বলে নাও মানতে চায় তবু এটি পারফরম্যান্স হিসেবেই পরিগণিত। এটি তিনি তাঁর পারফরম্যান্স থিওরিতে ব্যাখা করে প্রমাণ করে দিয়েছেন। টাঙ্গাইল অঞ্চলের চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈঠকি গানে প্রচলিত এবং পালনীয় কৃত্যানুষ্ঠানও নাট্যিক অনুষঙ্গকেই তুলে ধরে।

যেহেতু বাউল গানেরই প্রবাহিত ধারারূপে বৈঠকি গান পরিচিত, তাই এদের নির্মাণ শৈলীও একইরূপ। তবে পরিবেশনাগত ভিন্নতায় এদের নির্মাণ শৈলীরও কিছু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈঠকি গানে অভিভাবকেরা ভূতেধরা রোগের চিকিৎসা হিসেবে বৈঠকি গানের আয়োজন করেন। নির্ধারিত দিনে কবিরাজ তার শিষ্য দোহারদের নিয়ে উপস্থিত হন। সাধারণত রাত ৮/৯ টার দিকে দলের সবাই বৈঠক করে বসে পরিবেশনা শুরু করে।

প্রথমে ভূতে ধরা রোগীকে গানের আসরের মাঝখানে আনা হয়। তারপর রোগীকে পশ্চিম দিকে মুখ করে বসানো হয়। কবিরাজ ও রোগী মুখোমুখি বসেন। রোগীর মোনাজাত ধরা হাতে দেওয়া হয় রক্তজবা ফুল এবং সামনে রাখা হয় একটি টুলের আকৃতির সজ্জিত আসন। আসন সাজানো হয় আগরবাতি, মোমবাতি, জবাফুল,ধূপ ও সিঁদুর দিয়ে। আসনের বাঁ পাশে মাটিতে কলাপাতা বিছানো থাকে। কলা পাতায় সিঁদুর দিয়ে আঁকা হয় বিকট আকৃতির কয়েকটি মানুষ। রোগীর চোখে খাঁটি সরিষার তেল পড়ে দেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় বৈঠকি গান। প্রথমেই বন্দনায় আল্লাহ-নবি, পির-ফকির, ওলি-আউলিয়াদের স্মরণ করা হয়। একটার পর একটা গান চলতে থাকে। গানের ভাব যখন চূড়ায় পৌঁছে তখন কবিরাজ ও রোগীর ভার আসে (কবিরাজের মাটি চাপড়ানোকে ভার বলে)। রোগীর ভার এলেই কবিরাজ রোগীর চারদিকে লাঠি দিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করেন। ভারের সময় রোগী হু হু শব্দ করতে থাকে। তারপর চলে রোগীর সওয়াল জবাব। কবিরাজের কথায় ভয়ে রোগীর শরীর থেকে জিন বা ভূত পালিয়ে যায়। এ সময় রোগী আসর ছেড়ে দৌড় দেয় এবং কিছুদূর যাওয়ার পর দুর্বলতার কারণে সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। লোকজন তাকে ধরে নিয়ে এসে পানি ছিটিয়ে তার জ্ঞান ফেরায় আর বৈঠকি গায়েনও তাঁর গান শেষ করেন। অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈঠকি গানের নির্মাণ শৈলী ও পরিবেশনায় নাট্যিক অনুষঙ্গ বিদ্যমান।

নাট্যধর্মী পরিবেশনা হলেও এর আদ্যোপান্ত সংগীতের ছোঁয়ায় সজ্জিত। সুনির্দিষ্ট অভিনয়রীতি এখানে নেই। তবে সংলাপের ব্যবহার প্রায়ই লক্ষ করা যায়। গীতি নাট্যাঙ্গিকের শৈল্পিক ছোয়ায় গড়ে ওঠা পাঁচালি ভাবধারার একটি মনোমুগ্ধকর পরিবেশনারূপে বৈঠকি গান গীতাভিনয়ের এক সৃজনশীল প্রকাশ। চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈঠকি গান মূলত আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনা। এখানে নেই কোনো অতিরঞ্জিত মঞ্চ ব্যবস্থাপনা। পর্যবেক্ষণকৃত পরিবেশনায় দেখা যায় রোগীর বাড়ির উঠানে সমতল ভূমিতে ত্রিপল বিছিয়ে মঞ্চ বা আসরের আয়োজন করা হয়। বর্গাকৃতির এই ত্রিপলটিই মূলত আসরের মূল আয়তন। আসরের চারপাশে দর্শক বসে আর মাঝখানে গোল করে বসেন গায়েন, দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীরা। আসর বা মঞ্চে কেনো প্রকার অতিরঞ্জিত সাজসজ্জা নেই। কেবল কৃত্যানুষ্ঠানের

জন্য আসনটি মোমবাতি, আগরবাতি, চালের পাত্র, সরিষার তেল ভরতি বাটি ও জবাফুল দিয়ে সাজানো হয়। আসরের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ করা হয় না। কেননা দর্শকের উপর এর আয়তন বিবেচ্য। মোঃ আব্দুল করিম মিঞা বলেন– 'আসরের মাঝে গোল করে গায়েন, দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীদের চতুর্দিকে দর্শকরা বসে। বৈঠকি গান উপস্থাপনার জন্য মাঝের জায়গা এবং দর্শক সারি এমনকি ঘরের বারান্দাসহ আসরের আয়তন' (আবদুল করিম, ২০১৬)। অর্থাৎ দর্শক উপস্থিতি ও আয়োজনের উপর এর পরিধি নির্ভর করে।



চিত্র : চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈঠকি গানের আসর

ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যাঙ্গিকগুলোর ন্যায় চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈঠকি গানের আসরেও আধুনিক আলোক সজ্জার ব্যবহার নেই। পূর্বে হেজাক লাইট দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হলেও এখন ব্যাটারি চালিত সাদা লাইট কিংবা বিদ্যুতের সাদা লাইট দিয়েই উপস্থাপনা মঞ্চ এবং দর্শক আসনে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত দর্শকরা গান উপভোগ করার সাথে সাথে কবিরাজ ও রোগীর নাট্যিক আচরণও অবলোকন করেন।

খ. ভজন বৈঠকি

ভজন শব্দের অর্থ স্রষ্টার মহিমা কীর্তন। স্রষ্টার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মহিমা কীর্তনমূলক যে গান গাওয়া হয় তাকে ভজন বৈঠকি গান বলে। গুরুসেবার মধ্যদিয়ে পরম গুরুর সান্নিধ্য পাওয়া যায়– অন্তর্নিহিত এই ভাবের জন্যই ভক্তের নিকট ভজন গানের স্থান এত উচ্চে। প্রায়ই দেখা যায় গ্রামের বয়োবৃদ্ধ ভাবুক শ্রেণির লোকেরা জোৎস্না রাতে কারো বৈঠকখানায় বা বাড়ির উঠানে ভজন গানের আসর জমায়। সব ঋতুতেই পরিবেশনা হয়ে থাকলেও মূলত শীতকালেই এই আয়োজন বেশি দেখা যায়। ভজন গানের গায়েন বা শ্রোতার সংখ্যা অনির্দিষ্ট। কেননা কয়েকজন মিলে আয়োজন করে শুরু করলেও ধীরে ধীরে তাদের সাথে

শিল্পী, বাদক, শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভাবুক শ্রেণির মানুষেরা রাতের খাবার খেয়ে পেট ভরালেও মনের ক্ষুধা তাদের ঠিকই থেকে যায়। তাই ভক্তি গানের সুর আর বাদ্যের শব্দ শুনে তারা ছুটে যায় বৈঠকি আসরে। তবে ভক্ত-শ্রোতার সংখ্যা শতকের উপর হলেও গায়েনের সংখ্যা সীমিতই থাকে। যারা গান জানেন তারাই গায়েনের ভূমিকা পালন করেন। বাদ্যযন্ত্রীদের অনেকেই বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আক্ষরিক জ্ঞানশূন্য হলেও গানের সাথে দারুণভাবে মিলিয়ে বাজিয়ে যায়। এ যেন আত্মার মেলবন্ধন। দর্শক-শ্রোতারাও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। রাত যত গভীর হয় গানের ভাব তত বাড়তে থাকে। পরম গুরুর প্রেম সায়রে ডুব দেয় গুরু-শিষ্য সকলেই। গান গাইতে গাইতে অঝোরে কাঁদতে থাকে গায়েন, বাদক আর সাথে ভক্ত-প্রেমীরাও। পরম গুরু অর্থাৎ দয়াল গুরুকে পাওয়া না পাওয়ার বেদনা মিশ্রিত সুর যেন অনন্তকাল ধরে সয়ে যাওয়া দাসত্ব থেকে মুক্তির হৃদয়ফাটা হাহাকার। নাট্যিক প্রসঙ্গ অনুসন্ধানে গীতাভিনয়ের এক চোখ ধাঁধানো প্রাণকাড়া উপস্থাপন এই ভজন বৈঠকি। অধিকাংশ ভজন বৈঠকি গানেই দেখা যায় পরম গুরুকে না পাওয়ার বেদনা মিশ্রিত আর্তনাদ।

মালা কার লাগিয়া গাঁথি
আমি কার লাগিয়া গাঁথি
মালা আমি হারাইয়াছি সাথিরে
মালা কার লাগিয়া গাঁথি।

অচিনা এক নদীর স্রোতে
আমি হারাইয়াছি সাথিরে
মালা কার লাগিয়া গাঁথি।

রোজ নীশিথে বাসর সাজাই
ও সখিরে ফুলে দেই মালতি
বন্ধু বিনে একা ঘরে আমি
কাইন্দা কাটাই রাতিরে।
সবুজ ঘাসে বসতাম দুইজন
ও সখিরে শাড়ীর আচল পাতি
ফুলে যেমন ভ্রমর বসে
করে মাখামাখিরে।

আমার মরণ হলে হতো ভাল
ও সখিরে কান্দার হতো সমাপ্তি
আলোর দুইচোখ কান্তে কান্তে
চোখে নাই আর যতিরে॥
(ওয়াখিল, ২০১৬)

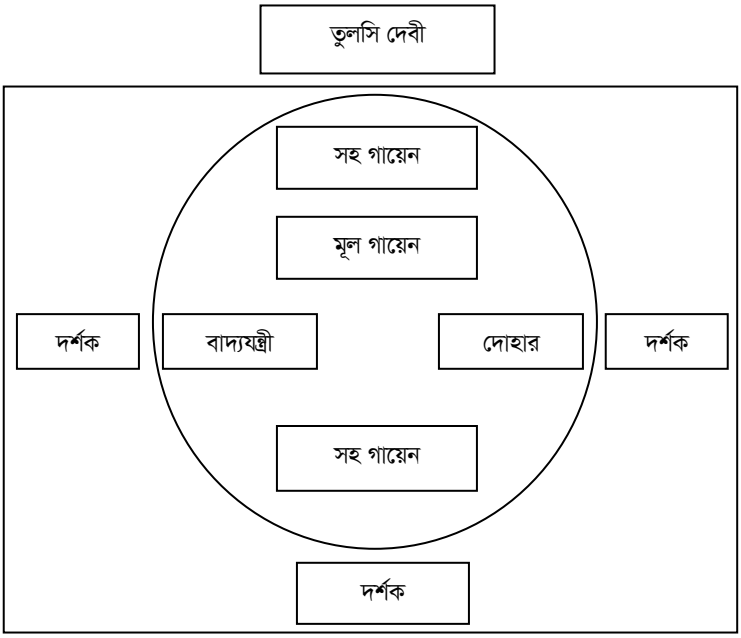
পরম গুরুকে না পাওয়ার এই যে আরতি তাই এখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। সাথিরূপে পরম গুরুকেই খুঁজে ফেরে ভক্তের মন। গান গাইতে গাইতে পরম আত্মার সাথে সন্ধি স্থাপনের কুহকে গায়েন, দোহার ও দর্শক ভক্তের যে শারীরিক অঙ্গভঙ্গিমা তা যেন নাট্যিক প্রসঙ্গকে বাস্তবতার সাথে একীভূত করে তোলে।

প্রায়শই দেখা যায় ভাবুক শ্রেণির সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে স্রষ্টার মহিমা কীর্তনের জন্য ভজন বৈঠকি গানের আয়োজন করে থাকে। সব সময় যে দিন ক্ষণ ঠিক করে বৈঠক বসে তেমনটি নয়। কখনো কখনো হঠাৎ করেই এই আয়োজন হয়ে থাকে। গান শুরু হওয়ার আগে আসরে উপবিষ্ট গুরুর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে ভক্তি নিবেদন করা হয়। গুরুর পরে মালা পরিয়ে দেওয়া হয় অন্যান্য গুরু ভক্ত সতীর্থদের গলায়। ভক্তিভরে সজ্জিত করা হয় পরম গুরুর আসন। মোমবাতি, আগরবাতি, সিঁদুর, জবাফুল প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হয় এই আসন। আসন সজ্জিত করে আসরে আনার সময় উপস্থিত ভক্ত শিষ্যরা হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে পরম গুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নাট্যিক এ কৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর শুরু হয়ে যায় গুরু বা পরম গুরুকে ভজনার জন্য বিভিন্ন গান। এখানে গায়েনরূপী অভিনেতাসহ গুরু-শিষ্য অর্থাৎ অভিনেতা দর্শক সবাই নিজেদেরকে গান ও বাদ্যের সাথে স্রষ্টার মহিমা কীর্তনে বিলিন করতে ব্যতিব্যস্ত। নাট্যতাত্ত্বিক গ্রটোস্কি তাঁর অভিনেতাদের প্রস্তুত করতে শরীরকে যে শূন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন তা যেন ভজন বৈঠকি গানে উপস্থিত সকলের শারীরিক ও আত্মিক সমন্বয় স্বরূপ। তাছাড়া বাস্তব জীবনাচরণের এই উপস্থাপনা যেন পিটার ব্রুকের হলি থিয়েটারকেও সমর্থন জোগায়।

ভজন বৈঠকি গান হিন্দু-মুসলমানের অবাধ বিচরণভূমি হলেও মূলত টাঙ্গাইল অঞ্চলে সনাতন ধর্মাবলম্বী ভক্তবৃন্দের আরাধনা সংগীতরূপে প্রচলিত। বৈষ্ণব বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তরা ভজন সংগীতের মাধ্যমে আসর কেন্দ্রিক পরিবেশনা করে থাকে। এতে মূল চরিত্রে ভূমিকা পালন করে গায়েন নিজেই। সংগীত পরিবেশনের সময় তিনি ক্ষণিকের জন্য নানা চরিত্রের রূপায়ণ ঘটিয়ে থাকেন। তবে এতে নির্দিষ্ট কোনো স্থায়ী চরিত্রের প্রতিফলন ঘটানো হয় না। কেননা ভজন বৈঠকি গানে চরিত্র নির্ভর নাট্য পরিবেশনা সাধারণত দেখা যায় না। সবকিছু ছাপিয়ে মূল গায়েনই এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র। তিনিই কথক, গায়ক এবং বর্ণনাকারী রূপে আবির্ভূত হন। যেহেতু গায়েনের পরিবর্তন হয় তাই গায়েনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় চরিত্রেরও পরিবর্তন হতে পারে। এই গায়েনের সাথে পার্শ্ব চরিত্ররূপে যুক্ত হয় দোহার, বাদ্যযন্ত্রী ও দর্শক ভক্তরা। আসরে উপস্থিত গুরু এখানে স্বতন্ত্র চরিত্রে উপবিষ্ট থাকেন। ভজন বৈঠকি গানে মূলত কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা কাহিনি বর্ণনা করা হয় না। তবে কোনো কোনো সময় রাধা কৃষ্ণের নাম জপমালা রূপে গীত হলেও কৃষ্ণলীলা বা তৎসম্বন্ধীয় কোনো কাহিনি এখানে বর্ণনা করা হয় না। মূল বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পায় গুরু ভজনের মাধ্যমে পরম গুরু বা স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা। পাঁচালি আঙ্গিকের পর্যায়ভুক্ত বৈঠকি ধারায় গীতের প্রাধান্যই বেশি। তবে উপস্থাপিত গীতই এখানে নাট্যিক পরিবেশনার উপাদান রূপে পর্যায়ভুক্ত।

বৈঠকি ধারার অন্যান্য নাট্যাঙ্গিকের ন্যায় ভজন বৈঠকি গানেও দেখা যায় আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনা। তবে সময় সময় স্থানিক ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়, যেমন– বাড়ির উঠান, মন্দির প্রাঙ্গণ, বসার ঘর প্রভৃতি স্থান। তুলসি দেবীর (তুলসি গাছ) সামনে উঠানের ফাঁকা জায়গায়ই এই পরিবেশনা বেশি দেখা যায়। ভজন বৈঠকি গানে আলাদা করে মঞ্চ তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। পাটি, চট, ত্রিপল কিংবা শীতের দিন শুকনা খড় বিছিয়ে উপস্থাপনার জায়গা ও দর্শক

আসনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মাঝখানে থাকে গায়েন, দোহার, বাদ্যযন্ত্রীরা আর তাদের কেন্দ্র করে চতুর্দিকে থাকে দর্শক ভক্তদের আসনব্যবস্থা।



চিত্র : ভজন বৈঠকি গানের আসর

ভজন বৈঠকি গানের আসরে কোথাও কোনো সাজসজ্জার অতিরঞ্জিত ব্যবহার নেই। আসর আভরণ, পোশাক, রূপসজ্জা সবকিছুই যেন নাট্যিক অনুষঙ্গ বিশ্লেষণে গ্রটোস্কির পোর থিয়েটারকে সমর্থন করে। কৃত্যাচার পালনার্থে অনেক সময় দেখা যায় আসরের মধ্যখানে একটি ঘট স্থাপন করা হয়। মাঁটির বা পিতলের এই ঘটের ভিতর থাকে সিঁদুর রাঙানো আমপাতা।পুরো উপস্থাপনা জুড়ে নাট্যিক পরিবেশনার আমেজ না থাকলেও পরিবেশনাকে ঘিরে এরূপ ছোটো ছোটো নাট্যিক উপাদান ঐতিহ্যবাহী এই আঙ্গিককে নাট্যিক ব্যঞ্জনায় ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করে।

গ. ভাব বৈঠকি গান

জাগতিক নানা কর্মের বন্ধনে নিজেকে ব্যস্ত রেখে স্রষ্টার নির্দেশিত পথে না চলতে পেরে ভক্তের মনে বড়ো খেদ। স্রষ্টার সেই সঠিক পথের সন্ধানের জন্য ভক্তগণ পিরের সাহায্য প্রার্থনা করে। এর মাধ্যমে ভক্ত মানব গুরুর চরণ পরিচর্চা করেই পরম গুরুর নৈকট্য পেতে চান। ভক্তের বিশ্বাস পরম গুরুকে ইহজনমে না পেলে মানবজনমই বৃথা। তাই ভক্ত গুরুর চরণ ভজনা করার জন্য এত ব্যাকুল। ভক্তরা পরম গুরুকে দয়াল, দয়াল গুরু, দয়াল চান, মুর্শিদ, মুর্শিদ চান ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। সাধারণত গুরু বা পিরের ভজনায় উরস উপলক্ষ্যে বৈঠক

জমিয়ে যে গান গাওয়া হয়, তাই ভাব বৈঠকি গান নামে পরিচিত। স্রষ্টার সান্নিধ্য কামনায় এখানেও গাওয়া হয় মারফতি তত্ত্বের গান।

সাধের গুরু না ভজিয়া রে
আমার অসাধনায় দিন যায়।
আমার দিনতো গেল
ও আমার দিন ফুরাইল
ভজনের সময় গেল বইয়া
অসাধনায় আমার দিন যায়॥
কি কর মনরে আমার
পাল দেহে বসিয়া
গুরুর নামটি মুখে লইয়া
এ পরাণ যাওনা বাহির হইয়া॥
(রেখা, ২০১৬)

তবে গায়েনরা গান শুরু করার পূর্বে বন্দনা গাইতে কখনোই ভুল করেন না। বন্দনায় স্রষ্টার মহিমা কীর্তন ছাড়াও নবি-রাসুল, গাউস-কুতুব, অলি-আউলিয়া, পির-পিরালি সকলের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। ভাব বৈঠকি গানে সকল ধর্মের মানুষের উপস্থিতি থাকলেও সাধারণত মারফতপন্থি মুসলমানরাই এই আয়োজন করে থাকে। চাঁদের বা বাংলা মাসের হিসাব অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে পিরের বাড়িতে এই আয়োজন করা হয়। বছরের অগ্রহায়ণ মাস হতে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ভাব বৈঠকি আয়োজন বেশি দেখা যায়। এই সময়টাতে তুলনামূলক আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় উরস পালনে এ সময়কেই উপযুক্ত রূপে বিবেচনা করা হয়। উরসে গুরু এবং ভক্তের ভাবকে আরও বেশি জাগ্রত করে তুলতেই আয়োজন করা হয় বৈঠকি গানের।

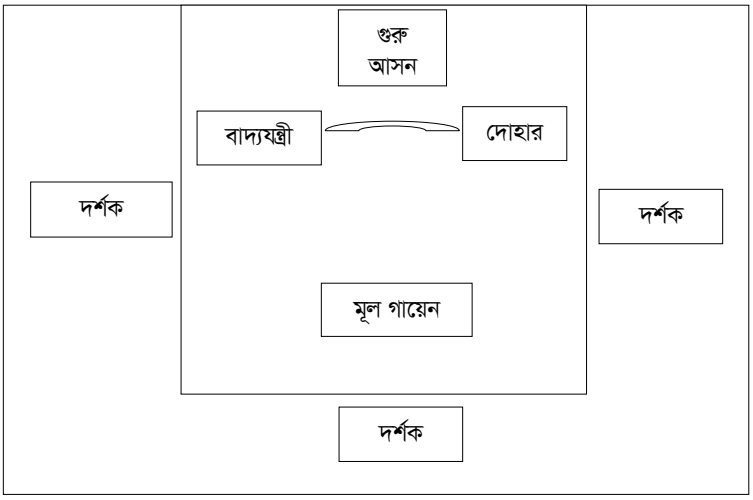
ভাব বৈঠকি গানে গায়েনদের আলাদা আলাদা ভক্তিমূলক গান ও বিচ্ছেদ গান পরিবেশনা ছাড়াও পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরিবেশনা লক্ষণীয়। গুরু-শিষ্য, শরিয়ত-মারফত, হাশর-কিয়ামত, জীবাত্মা-পরমাত্মা, নারী-পুরুষ প্রভৃতি বিষয়ে দুপক্ষের হাড্ডা-হাড্ডি গানের লড়াই। মূলত রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর থেকে শুরু হয় ভাব বৈঠকি গানের মূল পর্ব। ভক্তিপূর্ণ বিচ্ছেদ গানের ভাবে বিভোর হয় ভক্তকুল। দয়াল মুর্শিদকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে। এই সময় আসরে তৈরি হয় এক পবিত্র মায়া। দুপক্ষের পালাভিনয় কিংবা ভক্তিপূর্ণ গানের সুরে, তালে ভক্তদের আর্তনাদে যে শরীরী ভঙ্গিমা তৈরি হয় তা সহজেই নাট্যিক অনুষঙ্গকে ছাপিয়ে যায়।

ভাব বৈঠকি গানের নির্মাণ শৈলীতে দেখা যায় গান শুরুর আগে গুরুর গলায় ফুলের মালা পরানো হয়। আগরবাতি, মোমবাতি, চাল, টাকা সুগন্ধি ফুল প্রভৃতি দিয়ে সজ্জিত আসনের সামনে গিয়ে গুরু বসেন। পির বা গুরু ভক্ত দর্শক গুরুকেই পরম পূজ্য মেনে তাঁর মাধ্যমে স্রষ্টাকে পেতে চায়। তাদের ধারণা গুরু সিদ্ধ পুরুষ। তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্য পেয়েছেন এবং তিনিই ভক্তদের পথ দেখাবেন। ভাব বৈঠকিতে যে পালা উপস্থাপনা দেখা যায় যেমন— গুরু-শিষ্য, শরিয়ত-মারফত, হাশর-কিয়ামত, জীবাত্মা-পরমাত্মা প্রভৃতি এদের মাধ্যমে ভাবুক ভক্তরা বিভিন্ন ভাব সম্পর্কে জানতে পারে। কে গুরু? কী তাঁর পরিচয়? কতটুকু তার জানার পরিধি? ভক্ত কতটুকু গুরুর কাছ থেকে নিতে পারে? শরিয়ত-মারফত কী? সমস্ত ব্যাখ্যা ভাবুক ভক্তরা গানের মাধ্যমেই খোঁজেন—

গুরু ভজন নয়রে সোজা
মানুষ হয়ে মানুষ ভজা
মরা মানুষ হয়রে তাজা
ডুবলেরে সেই প্রেম সাধনায়।।
(শাহ্জাহান, ২০১৬)

এই যে প্রশ্ন এবং বর্ণনা বা গানে গানে আবার সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সুগঠিত তাৎক্ষণিক উপস্থাপনা, এতে নাট্যিক অনুষঙ্গ আলাদা করে খুঁজে পেতে হয় না। তাছাড়া বন্দনা গীত, গুরু-শীষ্যের আলিঙ্গন, মালা পরিবর্তন, গায়েনের বর্ণনা সব কিছুতেই নাট্যিক অনুষঙ্গ স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান।

বৈঠকি গানের অন্যান্য ধারা অপেক্ষা উরশ উপলক্ষে আয়োজিত ভাব বৈঠকি গানে যে শরীয়ত-মারফত, গুরু-শিষ্য, হাশর-কিয়ামত, জীবাত্মা-পরমাত্মা, নারী-পুরুষ প্রভৃতি পালার আয়োজন করা হয় তার জন্য আয়োজককে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। কেননা এই ধরনের আসরে দর্শকের সমাগম তুলনামূলক বেশি হয়। এজন্য আসরের পরিধিও বড় করতে হয়। সাধারণত সমতল ভূমিতে একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে চট বিছিয়ে এবং উপরে সামিয়ানা টানিয়ে আসর বসানো হয়। আসরের মাঝখানে অথবা যেকোনো একদিকে মঞ্চের জায়গা তৈরি করা হয়। মঞ্চ একদিকে থাকলে দর্শক সারি থাকে তিন দিকে। আর মঞ্চ মাঝখানে থাকলে দর্শক সারি থাকে চতুর্দিকে। আসরগুলো অনেক সময় বর্গাকৃতি হয়। মূল মঞ্চের জন্য ভূমির উপর চারটি খুঁটি আট হাত দূরত্বে পুঁতে দেওয়া হয়। পরিবেশনার এই মূল জায়গাকে বলে কুঞ্জ। কুঞ্জকে ঘিরে তৈরি হয় দর্শক বসার স্থান। যার চারপাশে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গার উপর টানানো হয় সামিয়ানা। কুঞ্জের উপর আলাদা করে রঙিন কাপড়ের সামিয়ানা টানানো হয় এবং ফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। মূল আসরের (কুঞ্জের ভিতর) বাম পাশে বসে বাদ্যযন্ত্রীরা, ডান পাশে বসে দোহাররা, মাঝখানে থাকেন মূল গায়েন। মঞ্চের পিছন দিকের মধ্যভাগে থাকে আসন। যেখানে পির বা গুরু আসন গ্রহণ করেন।



চিত্র : ভাব বৈঠকি গানের আসর।

মহিলাভক্তদের জন্য মূল মাঞ্চের (কুঞ্জের) এক পাশে আলাদা করে বসার ব্যবস্থা করা হয়। নাট্যিক উপস্থাপনায় সংগীতালাপের মধ্য দিয়ে গুরু-ভক্তের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে ভাব বৈঠকি গানের এই আসরে।

সুতরাং বৈঠকি গানকে আমরা নাট্যমূলক সংগীত ধারারূপে উল্লেখ করতে পারি, যা ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যধারার মিশ্র নাট্যের অন্তর্গত। কেননা মিশ্র নাট্যে চরিত্রাভিনয় দ্বারা কোনো কাহিনি বা ঘটনা উপস্থাপিত না হলেও নাট্যাঙ্গিকের অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যই এতে বিদ্যমান। ছোটো ছোটো নাট্যিক অনুষঙ্গ বৈঠকি গানের তিনটি ধারাতেই লক্ষণীয়। ভাব বৈঠকি গানে দুপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক উপস্থাপন অনেকটা ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য-আঙ্গিক কবিগানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভজন বৈঠকি কিংবা চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈঠকি গানে কৃত্যাচার পালন, বন্দনা গীত, সংলাপ, বর্ণনা এবং শারীর অভিনয় প্রভৃতি সবকিছুতেই নাট্যিক অনুসঙ্গ বিদ্যমান। অনেকে আবার নাট্যশৈলী নির্ভর এই সংগীত উপস্থাপনাকে নাটগীত হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে তাও সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক হবে না। কেননা নাট্যগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো, এতে নাট্য ঘটনার মধ্য দিয়ে গীত রচিত হবে। বৈঠকি গানের উপস্থাপনায় তা পরিলক্ষিত হয় না। গীতাভিনয়ের একটি সুস্পষ্ট ধারারূপে চলমান। তাই স্বতন্ত্র নাট্য আঙ্গিকরূপে একে উপস্থাপন যুক্তিহীন। তবে বৈঠকি গানে বিদ্যমান নাট্যিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে একে সহজেই ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য আঙ্গিকরূপে মূল্যায়ন করা যায়।

সহায়কপঞ্জি

মোঃ আবদুল করিম মিঞা (২০০৮)। *টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীত*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মোঃ আবদুল করিম মিঞা (২০০৯)। *টাঙ্গাইল অঞ্চলের বাউল গান স্বরূপ ও দর্শন*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *সম্পা.* (১৯৮২)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* (১ম খণ্ড)। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

সাক্ষাৎকার ও কথিকা

ধারণকৃত অডিও, ওয়াখিল চন্দ্র ভারারী, ভজন গায়েন, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১৪ মার্চ ২০১৬।
ধারণকৃত অডিও, মোঃ আবদুল করিম মিঞা, গবেষক ও অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১০ মার্চ ২০১৬।
ধারণকৃত অডিও, শাহ্জাহান সরকার, ভাব বৈঠকি গায়েন, চীনামুড়া, টাঙ্গাইল, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১৮ মার্চ ২০১৬।
ধারণকৃত অডিও, রেখা সরকার, বাউল শিল্পি, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১৮ মার্চ ২০১৬।
ধারণকৃত অডিও, হামিদ আলী চৌকিদার, চিকিৎসা বৈঠকি গায়েন, মশাজান, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১৬ মার্চ ২০১৬।
মাযাহারুল ইসলাম, *বাউল, বেতার-কথিকা*, (ঢাকা : বেতার কেন্দ্র) তারিখ : ০৬-০৫-১৯৬৭।